বাংলা সাহিত্য চয়নিকা

উচ্চতর মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের পাঠ্যপুস্তক

অসম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

রাষ্ট্রীয় পাঠ্যক্রম পরিকাঠামো 2005 -এর (NCF-2005) আধারে

অভিসারের পূর্ব-প্রস্তুতি

গোবিন্দদাস

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য :

মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে তথা ব্রজবুলি ভাষায় রচিত এই পদটির মাধ্যমে ব্রজবুলি ভাষার সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় করানোর উদ্দেশ্যে এই পদটি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হল।

কবি পরিচিতি :

মুর্শিদাবাদের তেলিয়াবুধুরিতে চৈতন্যোত্তর যুগের এইকবি জন্মগ্রহণ করেন। মাতা সুনন্দা দেবী। পিতা শ্রীচৈতন্যভক্ত চিরঞ্জীব সেন। মাতামহ পণ্ডিত দামোদর। কবি গোবিন্দদাস প্রথমে শাক্ত ছিলেন। পরে শ্রীনিবাস আচার্যের দীক্ষায় বৈষ্ণব হন। গৌরচন্দ্রিকা, গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ ও অভিসার পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস। চৈতন্যপূর্ব যুগের কবি বিদ্যাপতির সঙ্গে তুলনা করে এঁকে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'ও বলা হয়। ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনায়ও তিনি একজন দক্ষ কবি হিসেবে স্বীকৃত।

মূল পাঠ

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।

গাগরি বারি ঢারি করু পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।
হরি অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনি জাগি।।
করযুগে নয়ন মুদি চলু ভাবিনি
তিমির পয়ানক আশে।
কর কঙ্কণ পণ ফণি মুখ বন্ধন
শিখই ভুজগগুরু পাশে।।
গুরুজন বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ।।

পাঠবোধ :

বহু দুর্যোগপূর্ণ পথ অতিক্রম করে শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছতে হবে। এই পদটিতে তাই তিনি বাড়িতেই দুর্গম পথ অতিক্রমের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পদটি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত অভিসার পর্যায়ের একটি অসাধারণ পদ। ছাত্র-ছাত্রীদের বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে পরিচয় করাতে হবে। কবিতাটি ব্যাখ্যার সময় এটির অপূর্ব ধ্বনিমাধুর্য ও শব্দমাধুর্য সম্বন্ধে আলোচনা করে এজাতীয় পদরচনায় গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব বোঝাতে হবে।

শব্দার্থ ও টীকা :

কণ্টক : কাঁটা।
মঞ্জীর : নূপুর।
চীর : ছেঁড়া কাপড়।
দুতর : দুস্তর, দুর্যোগপূর্ণ।
মন্দিরে : মধ্যযুগে মন্দির শব্দটি 'বাসগৃহ' অর্থে ব্যবহৃত হত।

কর-যুগ : দুই হাত দিয়ে।
ভামিনী : নারী।
কঙ্কণ : হাতের বালা। অলংকার বিশেষ।
ফণিমুখ-বন্ধন : সাপকে বশ করার মন্ত্র।
ভুজগ-গুরু : সাপের ওঝা ; সাপুড়ে।
বধির : যে কানে শোনে না।
মুগধী : মুগ্ধা, বিহ্বল।
পরমাণ : প্রমাণ, সাক্ষী।

প্রশ্নাবলি

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্যে প্রশ্ন ঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ১)
ক) গোবিন্দদাসের আদি পদবি কী ছিল?
খ) গোবিন্দদাসকে কী উপাধি দেওয়া হয়েছিল?
গ) 'অভিসারের পূর্ব-প্রস্তুতি' পদটি কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?
ঘ) গোবিন্দদাসের দীক্ষাগুরুর নাম কী?
২। সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্যে প্রশ্ন ঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ২/৩)
ক) গোবিন্দদাসের পিতা ও মাতামহের নাম লেখো।
খ) 'গাগরি বারি ঢারি করু পীছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি।"— চরণটি সরল বাংলায় বুঝিয়ে দাও।
গ) গুরুজনের এবং পরিজনের কথা শুনে শ্রীরাধা কেমন ব্যবহার করেছিলেন লেখো।
৩। দীর্ঘ উত্তরের জন্যে প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ৪/৫)
ক) 'অভিসারের পূর্ব-প্রস্তুতি' পদটির সারমর্ম তৈরি করো।
খ) "কণ্টক গাড়ি... লাগি"— ব্যাখ্যা করো।

অন্নদার আত্মপরিচয়

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য

'অন্নদার আত্মপরিচয়' কবিতাটি অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। এই পাঠের মধ্য দিয়ে কবি মধ্যযুগীয় সমাজের যে বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন এবং সেই চিত্রে যে আধুনিক যুগের ছোঁয়া লক্ষ করা যায়, ছাত্রছাত্রীদের কাছে সেটাই তুলে ধরা হয়েছে।

কবি পরিচিতি

অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। তিনি সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই একজন বিদগ্ধ কবি। ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলার অন্তর্গত পেঁড়ো গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় অভিজাত রাজবংশের সন্তান এবং কৃষ্ণরায়ের উত্তরপুরুষ ছিলেন। কবির মাতার নাম ভবানী। পিতার নিঃস্ব অবস্থার জন্য তাঁর শৈশব মাতুলালয়ে কাটে। তিনি চোদ্দো-পনেরো বছর বয়সেই সংস্কৃততে দক্ষ হয়ে ওঠেন। পরে ফারসি ভাষাতেও তাঁর বিশেষ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কবির জীবন ছিল খুবই দুর্ভাগ্যপূর্ণ, নানা ভাগ্য বিপর্যয়ের পর তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নজরে পড়েন এবং মহারাজের সভাকবি নিযুক্ত হন। তাঁর কবিত্বশক্তির জন্য মহারাজ তাঁকে 'রায়গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন। মহারাজ প্রদত্ত মূলাজোড়া গ্রামেই তিনি মাত্র ৪৮ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন (১৭৬০)। 'অন্নদামঙ্গল' কবির সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। এ ছাড়া তিনি 'নাগাষ্টক', 'রসমঞ্জরী' কাব্য ও সংস্কৃত ও হিন্দি মিশ্রভাষায় 'চণ্ডী' নামে একটি নাটক লিখেছিলেন।

মূলপাঠ

অন্নপূর্ণা উতরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।

পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে।।
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি।।
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনি।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি।।
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার।।
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি।।
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।।
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত।
পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত।।
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম।।
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন।।
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।।
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি।।
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে।।
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তার ঘরে যাই।।
পাটুনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল।।
শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল।

দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল।।
যার নামে পার করে ভবপারাবার।
ভাল ভাগ্য পাটুনী তাহারে করে পার।।
বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ।।
পাটুনী বলিছে মা গো বৈস ভাল হয়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে।।
ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল।
আল্‌তা ধুইবে পদ কোথা থুব বল।।
পাটুনী বলিছে মাগো শুন নিবেদন।
সেঁউতী উপরে রাখ ও রাঙা চরণ।।
পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতী উপরে।।
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়।
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায়।।
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতী উপরে।
তাঁর ইচ্ছা বিনা ইথে কি তপ সঞ্চরে।।
সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতী হইল সোনা দেখিতে দেখিতে।।
সোনার সেঁউতী দেখি পাটুনীর ভয়।
এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।।
তীরে উত্তরিল তরি তারা উত্তরিলা।
পূর্ব্বমুখে সুখে গজগমনে চলিলা।।
সেঁউতী লইয়া কক্ষে চলিল পাটুনী।
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি।।
সভয়ে পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল।।
হের দেখ সেউঁতীতে থুয়েছিলা পদ।

কাঠের সেঁউতী মোর হল অষ্টাপদ।।
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয়।।
তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার।।
যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয়।
সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয়।।
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া।
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া।।
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্লা অষ্টমীতে।।
কতদিন ছিনু হরিহোড়ের নিবাসে।
ছাড়িলাম তার বাড়ি কোন্দলের ত্রাসে।।
ভবানন্দ মজুমদার নিবাসে রহিব।
বর মাগ মনোমত যাহা চাহ দিব।।
প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।।
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিল বরদান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান।।
বর পেয়ে পাটুনী ফিরিয়া ঘাটে যায়।
পুনর্ব্বার ফিরে চাহে দেখিতে না পায়।।

পাঠবোধ ঃ দেবী অন্নপূর্ণার আত্মপরিচয় দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থব্যঞ্জক ভাষায় প্রকাশ করবার মধ্যে কবি যে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন তা এককথায় অনবদ্য, এছাড়াও কবিতাটিতে তৎকালীন সমাজের একটি সুন্দর চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। যেমন সমাজের ব্যাধিস্বরূপ কৌলিনপ্রথা, বহুবিবাহ, স্ত্রীর প্রতি উদাসীন, ভবঘুরে, নেশাঘোর স্বামীর নিত্য অভাব-অনটনের সংসার যাত্রা, কলহ-কোন্দল ইত্যাদি।

শব্দার্থ ও টীকা :

অন্নপূর্ণা : দেবী অন্নপূর্ণা হলেন ভগবতীরই অংশবিশেষ। দেবীর এই রূপ সম্বন্ধে একটি পুরোনো কাহিনি প্রচলিত আছে। কাহিনিটি হল একদিন মহাদেব ভগবতীর সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করে ভিক্ষা করতে বের হলেন। কিন্তু ভগবতীর মহিমায় মহাদেবের সেদিন কোথাও অন্ন জুটল না। অন্যদিকে দেবী ভগবতী অন্নপূর্ণা নাম গ্রহণ করে কাশীতে আত্মপ্রকাশ করেন এবং দরিদ্র জনসাধারণকে

অন্ন দান করতে লাগলেন। তখন শিব ভিখারির বেশে অন্নপূর্ণার কাছ থেকে অন্ন গ্রহণ করেন। কথিত আছে অন্নপূর্ণার দয়ায় কাশীতে কেউ-ই নিরন্ন থাকে না। তাই দেবীর অপর নাম 'অন্নদা'।

পাটনি : খেয়া পারাপারের মাঝি। খেয়া পারাবারের মাঝি স্ত্রী বা পুরুষ উভয়ই হতে পারে। এখানে পাটনি স্ত্রীলোক। কারণ প্রথমত, মাঝির নাম ঈশ্বরী (স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ) এবং দ্বিতীয়ত, কাঁখে নিয়ে যাওয়া (সেঁউতী লইয়া কক্ষে চলিল পাটনী) এই মাঝিকে এই দুই অর্থে স্ত্রী জাতির বলে ধরা হয়।

ত্বরায় : শীঘ্র।

কুলীন : বংশমর্যাদা-সম্পন্ন, কু-তে অর্থাৎ পৃথিবীতে লীন, আগম নিগম প্রভৃতিতে লীন।

বন্দ্যবংশ : বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ, বন্দনী বংশ বা দেবতা।

দ্বন্দ্ব : কলহ, বিবাদ।

পঞ্চমুখ : বাচাল অর্থে ব্যবহৃত, আবার পাঁচটি মুখ বিশিষ্ট মহাদেবও বোঝায়।

অহর্নিশ : দিনরাত।

কোন্দল : ঝগড়া, বিবাদ।

কোকনদ : পদ্ম, কমল।

সেঁউতি : নৌকার জল সেঁচবার পাত্র।

অষ্টাপদ : সোনা।

ভবানন্দ মজুমদার : মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ। মোঘল সেনাপতি মানসিংহ যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এলে ভবানন্দ পথ দেখিয়ে তাঁকে সাহায্য করেন। পরে প্রতাপাদিত্যকে বন্দি করে নিয়ে যাবার সময় মানসিংহ ভবানন্দকে সঙ্গে নিয়ে যান এবং তাঁর উপকারের বিনিময়ে মোঘল সম্রাটের কাছ থেকে পুরস্কারস্বরূপ জায়গিরের ব্যবস্থা করে দেন।

পুনর্বার : পুনরায়, আবার।

প্রশ্নাবলি

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্যে প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ১)

ক) 'অন্নদার আত্মপরিচয়' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?

খ) 'পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে'— মাতার পরিচয় দাও।

গ) 'জীবন-স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি'— এখানে 'জীবন-স্বরূপা' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

ঘ) 'সেঁউতী' বলতে কী বোঝ?

ঙ) 'পঞ্চমুখ' শব্দের দ্ব্যর্থবোধক দিক নির্দেশ করো।

চ) 'না মরে পাষাণ বাপ'— পাষাণ বাপটি কে?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্যে প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ২/৩)

ক) 'অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।'— বক্তার ভাই কে? তার সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার পৌরাণিক প্রসঙ্গটি বুঝিয়ে বলো।

খ) 'সিদ্ধিতে নিপুণ'— সিদ্ধি কথাটির দুইটি অর্থ কী কী?

গ) 'কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।'

উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় যে কথা বলা হয়েছে তা বুঝিয়ে বলো।

ঘ) 'ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী'— এখানে বর্ণিত উল্লিখিত দুই ঈশ্বরীর পরিচয় দাও।

ঙ) 'কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন'— কে কার সম্পর্কে একথা বলেছেন? মন্তব্যটির প্রকৃত অর্থ কী?

৩। দীর্ঘ উত্তরের জন্যে প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ৪/৫)

ক) দেবী অন্নদা হরিহোড়ের গৃহ ত্যাগ করলেন কেন? তিনি হরিহোড়ের গৃহ ত্যাগ করে কোথায় যাচ্ছেন?

খ) 'ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়'— কে কাকে এই কথা বলছিল? সে কীভাবে বুঝল যে উদ্দীষ্ট ব্যক্তি নিশ্চয় দেবতা?

গ) 'অন্নদার আত্মপরিচয়' পাঠটিতে তৎকালীন সমাজের যে ছবি ফুটে উঠেছে তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

ঘ) ঈশ্বরী পাটুনির চরিত্র সৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কতদূর সার্থক হয়েছেন তা এই চরিত্রটি বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।

ঙ) সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো :

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'।

ফুলের বিবাহ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পাঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্য :

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান পরিচয় ঔপন্যাসিক হিসাবে। সফল ঔপন্যাসিক হওয়ার পাশাপাশি তিনি একজন সার্থক প্রাবন্ধিক এবং নিবন্ধকারও ছিলেন। রস রচনায় তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর নিবন্ধগুলি বাংলা সাহিত্যের চিরকালীন সম্পদ। আপাত হাস্যরসের আড়ালে সমকালের সামাজিক ব্যাধিকে চিহ্নিত করার এ এক অনন্য আয়োজন। 'ফুলের বিবাহ' শীর্ষক পাঠটি 'কমলাকান্তের দপ্তর' থেকে সংকলিত। মহান স্রষ্টার সমাজমনস্কতা, কল্পনাশক্তি, প্রচ্ছন্ন কবিমন ও সরস উপস্থাপন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করানোর উদ্দেশ্যে পাঠটি নির্বাচন করা হল।

লেখক পরিচিতি :

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৬.৬.১৮৩৮—৮.৪.১৮৯৪)

চব্বিশ পরগণার কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক, 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের উদ্‌গাতা এবং বাংলার 'নবজাগরণ যুগের' অন্যতম প্রধান পুরুষ। বিদ্যাশিক্ষা মেদিনীপুর, হুগলি কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। আইন অধ্যয়ন শেষ হওয়ার আগেই সরকার তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত করেন। ৩৩ বছর সরকারি পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। ছাত্র-জীবনে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় তাঁর 'কামিনীর উক্তি' কবিতাটি পুরস্কৃত হয়। ইংরেজিতে রচিত কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস

'Rajmohan's Wife' (১৮৬৪)। প্রথম সার্থক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা ১৪টি। তার মধ্যে 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'বিষবৃক্ষ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উপন্যাস ছাড়াও তিনি আরো কিছু লেখা লিখেছিলেন। তার মধ্যে 'ললিতা', 'লোকরহস্য', 'বিজ্ঞানরহস্য', 'বিবিধ সমালোচনা', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী', 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত', 'কৃষ্ণচরিত্র' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য রচনা। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। তাঁকে সাহিত্যসম্রাট ও ঋষি বঙ্কিম উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

মূল পাঠ

বৈশাখ মাস বিবাহের মাস। আমি ১লা বৈশাখে নসী বাবুর ফুলবাগানে বসিয়া একটি বিবাহ দেখিলাম। ভবিষ্যৎ বরকন্যাদিগের শিক্ষার্থ লিখিয়া রাখিতেছি।

মল্লিকা ফুলের বিবাহ। বৈকাল-শৈশব অবসানপ্রায়, কলিকা-কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়া আসিল। কন্যার পিতা বড় লোক নহে, তাহাতে আবার অনেকগুলি কন্যাভারগ্রস্ত। সম্বন্ধের অনেক কথা হইতেছিল, কিন্তু কোনটা স্থির হয় নাই। উদ্যানের রাজা স্থল-পদ্ম নির্দ্দোষ পাত্র বটে, কিন্তু ঘর বড় উঁচু, স্থলপদ্ম অত দূর নামিল না। জবা এ বিবাহে অসম্মত ছিল না, কিন্তু জবা বড় রাগী, কন্যাকর্ত্তা পিছাইলেন। গন্ধরাজ পাত্র ভাল, কিন্তু বড় দেমাগ, প্রায় তাঁহার বার পাওয়া যায় না। এইরূপ অব্যবস্থার সময়ে ভ্রমররাজ ঘটক হইয়া মল্লিকা-বৃক্ষসদনে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন, "গুণ্! গুণ্! গুণ্ মেয়ে আছে?"

মল্লিকাবৃক্ষ পাতা নাড়িয়া সায় দিলেন, "আছে!" ভ্রমর পত্রাসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "গুণ্ গুণ্ গুণ্! গুণ্ গুণাগুণ্! মেয়ে দেখিব!"

বৃক্ষ, শাখা নত করিয়া, মুদিতনয়না অবগুণ্ঠনবতী কন্যা দেখাইলেন।

ভ্রমর একবার বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া বলিলেন, "গুণ্! গুণ্! গুণ্! গুণ দেখিতে চাই। ঘোম্‌টা খোল।"

লজ্জাশীলা কন্যা কিছুতেই ঘোম্‌টা খুলে না। বৃক্ষ বলিলেন, "আমার মেয়েগুলি বড় লাজুক। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি মুখ দেখাইতেছি।"

ভ্রমর ভোঁ করিয়া স্থলপদ্মের বৈঠকখানায় গিয়া রাজপুত্রের সঙ্গে ইয়ারকি করিতে বসিলেন। এদিকে মল্লিকার সন্ধ্যাঠাকুরাণী-দিদি আসিয়া তাহাকে কত বুঝাইতে লাগিল— বলিল, "দিদি, একবার ঘোম্‌টা খোল— নইলে, বর আসিবে না— লক্ষ্মী আমার, চাঁদ আমার, সোণা আমার, ইত্যাদি।" কলিকা কত বার ঘাড় নাড়িল, কত বার রাগ করিয়া মুখ ঘুরাইল, কত বার বলিল, "ঠান্‌দিদি, তুই যা!" কিন্তু শেষে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া মুখ খুলিল। তখন ঘটক মহাশয় ভোঁ করিয়া রাজবাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া ঘটকালীতে মন দিলেন। কন্যার পরিমলে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "গুণ্‌ গুণ্‌ গুণ্‌, গুণ্‌ গুণাগুণ! কন্যা গুণবতী বটে। ঘরে মধু কত?"

কন্যাকর্ত্তা বৃক্ষ বলিলেন, "ফর্দ্দ দিবেন, কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিব।" ভ্রমর বলিলেন, "গুণ্‌ গুণ্‌, আপনার অনেক গুণ্‌— ঘটকালীটা?"

কন্যাকর্ত্তা শাখা নাড়িয়া সায় দিল, "তাও হবে।"

ভ্রমর— "বলি ঘটকালীর কিছু আগাম দিলে হয় না? নগদ দান বড় গুণ— গুণ্‌ গুণ্‌ গুণ্‌!"

ক্ষুদ্র বৃক্ষটি তখন বিরক্ত হইয়া, সকল শাখা নাড়িয়া বলিল, "আগে বরের কথা বল— বর কে?"

ভ্রমর— "বর অতি সুপাত্র।— তাঁর অনেক গুণ-ন-ন্‌।"

"কে তিনি?"

"গোলাবলাল গন্ধ্যোপাধ্যায়। তাঁর অনেক— গুণ-ন—ন্‌।"

সকল কথোপকথন মনুষ্যে শুনিতে পায় না, আমি কেবল আফিমপ্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ পাইয়াই এ সকল শুনিতেছিলাম। আমি শুনিতে লাগিলাম, কুলাচার্য্য মহাশয়, পাখা ঝাড়িয়া, ছয় পা ছড়াইয়া গোলাবের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন যে, গোলাব বংশ বড় কুলীন ; কেন না, ইহারা "ফুলে" মেল। যদি বল, সকল ফুলই ফুলে, তথাপি গোলাবের গৌরব অধিক ; কেন না, ইহারা সাক্ষাৎ বাঞ্ছামালীর সন্তান ; তাহার স্বহস্তরোপিত। যদি বল, এ ফুলে কাঁটা আছে, কোন্‌ কুলে বা কোন্‌ ফুলে নাই?

যাহা হউক, ঘটকরাজ কোনরূপে সম্বন্ধ স্থির করিয়া বোঁ করিয়া উড়িয়া গিয়া, গোলাব বাবুর বাড়ীতে খবর দিলেন। গোলাব, তখন বাতাসের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা করিতেছিল, বিবাহের নাম শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া কন্যার বয়স জিজ্ঞাসা করিল। ভ্রমর বলিল, "আজি কালি ফুটিবে।"

গোধূলি লগ্ন উপস্থিত, গোলাব বিবাহে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। উচ্চিঙ্গড়া নহবৎ বাজাইতে আরম্ভ করিল ; মৌমাছি সানাইয়ের বায়না লইয়াছিল, কিন্তু রাতকাণা বলিয়া সঙ্গে যাইতে পারিল না। খদ্যোতেরা ঝাড় ধরিল ; আকাশে তারাবাজি হইতে লাগিল। কোকিল আগে আগে ফুকরাইতে লাগিল। অনেক বরযাত্র চলিল ; স্বয়ং রাজকুমার স্থলপদ্ম দিবাবসানে অসুস্থকর বলিয়া আসিতে পারিলেন না, কিন্তু জবাগোষ্ঠী— শ্বেত জবা, রক্ত জবা, জরদ জবা প্রভৃতি সবংশে আসিয়াছিল। করবীদের দল, সেকেলে রাজাদিগের মত বড় উচ্চ ডালে চড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সেঁউতি নীতবর হইবে বলিয়া, সাজিয়া আসিয়া দুলিতে লাগিল। গরদের জোড় পরিয়া চাঁপা আসিয়া দাঁড়াইল— বেটা ব্রাণ্ডি টানিয়া আসিয়াছিল, উগ্র গন্ধ ছুটিতে লাগিল। গন্ধরাজেরা বড় বাহার দিয়া, দলে দলে আসিয়া, গন্ধ বিলাইয়া দেশ মাতাইতে লাগিল। অশোক নেশায় লাল হইয়া আসিয়া উপস্থিত ; সঙ্গে এক পাল পিপ্‌ড়া মোসায়েব হইয়া আসিয়াছে ; তাহাদের গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কিন্তু দাঁতের জ্বালা বড়— কোন্ বিবাহে না এরূপ বরযাত্র জোটে, আর কোন্ বিবাহে না তাহারা হুল ফুটাইয়া বিবাদ বাধায়? কুরুবক, কুটজ প্রভৃতি আরও অনেক বরযাত্র আসিয়াছিলেন, ঘটক মহাশয়ের কাছে তাঁহাদের পরিচয় শুনিবেন। সর্ব্বত্রই তিনি যাতায়াত করেন এবং কিছু কিছু মধু পাইয়া থাকেন।

আমারও নিমন্ত্রণ ছিল, আমিও গেলাম। দেখি, বরপক্ষের বড় বিপদ্। বাতাস বাহকের বায়না লইয়াছিলেন ; তখন হুঁ— হুম্ করিয়া অনেক মর্‌দানি করিয়াছিলেন কিন্তু কাজের সময় কোথায় লুকাইলেন, কেহ খুঁজিয়া পায় না। দেখিলাম, বর বরযাত্র, সকলে অবাক্ হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। মল্লিকাদিগের কুল যায় দেখিয়া, আমিই বাহকের কার্য্য স্বীকার করিলাম। বর, বরযাত্র সকলকে তুলিয়া লইয়া মল্লিকাপুরে গেলাম।

সেখানে দেখিলাম, কন্যাকুল, সকল ভগিনী, আহ্লাদে ঘোম্‌টা খুলিয়া, মুখ ফুটাইয়া, পরিমল ছুটাইয়া, সুখের হাসি হাসিতেছে। দেখিলাম, পাতায় পাতায় জড়াজড়ি ; গন্ধের ভাণ্ডারে ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে— রূপের ভরে সকলে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। যূথি, মালতী, বকুল, রজনীগন্ধা প্রভৃতি এয়োগণ স্ত্রী-আচার করিয়া বরণ করিল। দেখিলাম, পুরোহিত উপস্থিত ; নসী বাবুর নবমবর্ষীয়া কন্যা (জীবন্ত কসুমরূপিণী) কুসুমলতা সূচ সূতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে ; কন্যাকর্ত্তা কন্যা সম্প্রদান করিলেন ; পুরোহিত মহাশয় দুই জনকে এক সূতায় গাঁথিয়া গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিলেন।

তখন বরকে বাসর-ঘরে লইয়া গেল। কত যে রসময়ী মধুময়ী সুন্দরী সেখানে বরকে ঘেরিয়া বসিল, তাহা কি বলিব। প্রাচীনা ঠাকুরাণীদিদি টগর সাদা প্রাণে বাঁধা রসিকতা করিতে করিতে শুকাইয়া উঠিলেন। রঙ্গণের রাঙ্গামুখে হাসি ধরে না। যূই, কন্যের সই, কন্যের কাছে গিয়া শুইল রজনীগন্ধাকে বর তাড়কা রাক্ষসী বলিয়া কত তামাসা করিল ; বকুল একে বালিকা, তাতে যত গুণ, তত রূপ নহে ; এক কোণে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল ; আর ঝুম্‌কা ফুল বড় মানুষের গৃহিণীর মত মোটা মাগী নীল শাড়ি ছড়াইয়া জমকাইয়া বসিল। তখন—

"কমলকাকা— ওঠ বাড়ী যাই— রাত হয়েছে, ও কি, ঢুলে পড়্‌বে যে?"

কুসুমলতা এই কথা বলিয়া আমার গা ঠেলিতেছিল; চমক হইলে দেখিলাম, কিছুই নাই। সেই পুষ্পবাসর কোথায় মিশিল?— মনে করিলাম, সংসার অনিত্যই বটে— এই আছে, এই নাই। সে রম্য বাসর কোথায় গেল,— সেই হাস্যমুখী শুভ্রস্মিতসুধাময়ী পুষ্পসুন্দরীসকল কোথায় গেল? যেখানে সব যাইবে, সেইখানে— স্মৃতির দর্পণতলে, ভূতসাগরগর্ভে। যেখানে রাজা প্রজা, পর্ব্বত, সমুদ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদি গিয়াছে বা যাইবে, সেইখানে— ধ্বংসপুরে! এই বিবাহের ন্যায় সব শূন্যে মিশাইবে, সব বাতাসে গলিয়া যাইবে— কেবল থাকিবে— কি? ভোগ? না, ভোগ্য না থাকিলে ভোগ থাকিতে পারে না। তবে কি? স্মৃতি?

কুসুম বলিল, "ওঠ না— কি কচ্চো?"

আমি বলিলাম, 'দূর পাগলি, আমি বিয়ে দিচ্ছিলাম।"

কুসুম ঘেঁষে এসে, হেসে হেসে কাছে দাঁড়াইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার বিয়ে, কাকা?"

আমি বলিলাম, "ফুলের বিয়ে?"

"ওঃ পোড়া কপাল, ফুলের? আমি বলি কি! আমিও যে এই ফুলের বিয়ে দিয়েছি।"

"কই?"

"এই যে মালা গাঁথিয়াছি।" দেখিলাম, সেই মালায় আমার বর কন্যা রহিয়াছে।

পাঠবোধ :

যথার্থ ব্যঙ্গ রচনার আড়ালে থাকে সমাজবোধ। বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে হাস্যরসাত্মক নাটক ও প্রহসনে এই ধারাটি প্রকট। বাংলা লঘু রসাত্মক নিবন্ধ সাহিত্যের ধারাটিও ঈর্ষণীয়। একেবারে হালের বাংলা সাহিত্যে এই ধারাটির সংক্ষেপিত তথা বিবর্তিত রূপটি রম্য রচনা হিসাবে স্বীকৃত। 'ফুলের বিবাহ' পাঠ করার পর এই রচনার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটি আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। ফুলের বিয়ে উপলক্ষে একত্রিত ফুল ও কীট পতঙ্গের ছায়ার নীচে কার্যত লুকিয়ে রয়েছে বাঙালির বিবাহ অনুষ্ঠানে সমবেত বিভিন্ন চরিত্র এবং তাদের কার্যকলাপ। হালকা হাসির নীচে চোখের জল লুকিয়ে রাখার এক নিরাভরণ কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এই রচনার বিস্ময়কর দিক হল অদ্ভুত দক্ষতায় বঙ্কিমচন্দ্র ফুলের জগতের উপমায় সম্পূর্ণ রচনাটি সাজিয়েছেন। এক নির্মল রস-উপভোগ এই রচনার অন্যতম প্রাপ্তি।

শব্দার্থ :

অবগুণ্ঠনবতী : ঘোমটা দেওয়া নারী।

ঠান্‌দিদি : ঠাকুমা অথবা ঠাকুমা সদৃশ বয়স্ক নারী।

ঘটকালী : যে ব্যক্তি মধ্যবর্তী হয়ে বিয়ের যোগ্য পাত্রপাত্রীর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করেন তাঁকে ঘটক বলে। এই সম্বন্ধ স্থাপন প্রক্রিয়ার নাম ঘটকালি ('ঘটকালী' পুরনো বানান, বর্তমানে বর্জিত)। আবার ঘটকের কাজের বিনিময়ে

প্রাপ্য অর্থাদিকেও ঘটকালি বলা হয়। আলোচ্য পাঠে দুই ভিন্ন অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

কড়ায় গণ্ডায় : কড়ি শব্দের অর্থ মুদ্রা। গণ্ডা গণনার একটি একক। কড়ায় গণ্ডায় শব্দের অর্থ বিস্তারিত হিসেব নিকেশ। বিশেষ করে প্রাপ্য আদায়ের ক্ষেত্রে এই শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কুলীন : সদ্‌বংশীয়। বল্লাল সেন প্রবর্তিত নবগুণবিশিষ্ট কুলমর্যাদাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ।

উচ্চিঙ্গড়া : উইচিংড়ে। এক ধরনের পোকা। ইংরেজি প্রতিশব্দ Cricket। উচ্চিঙ্গট শব্দের বিবর্তিত রূপ।

রাতকাণা : যিনি রাতে দেখতে পান না।

খদ্যোত : জোনাকি।

নীতবর : নিতবর ('নীতবর' পুরনো বানান, বর্তমানে বর্জিত) অথবা উচ্চারণভেদে মিতবর শব্দের অর্থ বিয়ের সময় যে বালক সহচর হিসাবে বরের পাশে থাকে। ওই বালককে কোলবরও বলা হয়ে থাকে।

মোসায়েব : চাটুকার। খোশামুদে।

কুরুবক : ঝিণ্টি ফুল বা ঝাঁটি ফুলের গাছ।

কুটজ : গিরিমল্লিকা ফুলের গাছ।

পরিমল : সুগন্ধ। কুসুমসৌরভ।

অনিত্য : চিরস্থায়ী নয় এমন। নশ্বর।

প্রশ্নাবলি

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ১)

ক) 'ফুলের বিবাহ' শীর্ষক পাঠটি কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?

খ) কোন ফুলের সঙ্গে কোন ফুলের বিবাহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে?

গ) ফুলের বিবাহে ঘটকালি কে করেছিল?

ঘ) পাত্র গোলাবলালের পদবি কী ছিল?

ঙ) ফুলের বিবাহে কে নিতবর হয়েছিল?

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ২/৩)

ক) ফুলের বিবাহ কোন মাসের কত তারিখে সম্পন্ন হয়েছিল?

খ) ঘটক যখন গোলাপের বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যায় তখন গোলাপ কী করছিল?

গ) বিয়েতে মৌমাছিরা কীসের বায়না নিয়েছিল এবং কেন সে কাজ করতে পারেনি?

ঘ) বরযাত্রায় কার বাহক হওয়ার কথা ছিল এবং শেষ পর্যন্ত কে বাহকের ভূমিকা পালন করেন?

ঙ) নসীবাবুর কন্যার নাম কী? তার বয়স কত বলে উল্লেখিত হয়েছে?

চ) বরযাত্রায় পিঁপড়েদের ভূমিকা কেমন ছিল?

৩। বড়ো প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক ৪/৫)

ক) গোলাপের সঙ্গে বিয়ে স্থির হওয়ার আগে মল্লিকার পিতা কোন কোন পাত্রের কথা বিবেচনা করেছিলেন এবং কেন সেগুলি কার্যকর হয়নি আলোচনা করো।

খ) ঘটক হিসাবে ভ্রমরের ভূমিকা বিস্তারিতভাবে লেখো।

গ) ফুলের বিবাহে বরযাত্রার বিবরণ দাও।

ঘ) ফুলের বিবাহে বাসরঘরের যে ছবি চিত্রিত হয়েছে তা বিস্তৃত করো।

ঙ) ফুলের বিবাহে বর্ণিত আখ্যানের আড়ালে বাঙালির বিয়ের যে বাস্তবতা লুকিয়ে আছে তা পরিস্ফুট করো।

চ) ফুলের বিবাহ অবলম্বনে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজমনস্কতার পরিচয় দাও।

ব্যাকরণ

১। প্রবাদ-প্রবচনগুলির নিহিতার্থ ব্যাখ্যা করো। অন্যান্য ভাষার মতো বাংলাভাষাও নানা প্রবাদ-প্রবচন এবং বাগ্বিধি-বাগ্‌ধারা দ্বারা সমৃদ্ধ। আবহমান কাল থেকে এগুলি বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে এসেছে। এগুলি মানুষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানপ্রসূত সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর ভাবপ্রকাশক উক্তি।
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ; অতি দর্পে হত লঙ্কা ; শাক দিয়ে মাছ ঢাকা ; অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট ; নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা ; অতি লোভে তাঁতি নষ্ট ; চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি ; শূন্য কলসির শব্দ বেশি ; টাকা চাই দেবে গৌরী সেন ইত্যাদি।

২। বাগ্বিধি-বাগ্‌ধারার অর্থ লেখো ও বাক্য রচনা করো—
খয়ের খাঁ ; গৌরচন্দ্রিকা ; আক্কেলসেলামি ; ব্যাঙের সর্দি ; শাঁখের করাত ; অমাবস্যার চাঁদ ; ডুমুরের ফুল ; কলুর বলদ ; চিনির বলদ ; তালপাতার সেপাই ; হ-য-ব-র-ল ; গোবর গণেশ ; আক্কেল গুড়ুম ; ইঁচড়ে পাকা ; হাতটান ; পুকুর চুরি ইত্যাদি।

৩। প্রতিশব্দ লেখো—
আকাশ ; আগুন ; জল ; পৃথিবী ; পদ্ম ; রাজা ; দিন ; রাত্রি ; সাপ ; পাখি ; নদী ; গৃহ ইত্যাদি।

৪। সমাস
পরস্পর অর্থ-সম্পর্কযুক্ত দুই বা দুইয়ের বেশি পদের একপদে পরিণত হওয়ার নাম সমাস। যেমন গাছে পাকা = গাছপাকা। নীল যে উৎপল = নীলোৎপল। যেসব পদের মিলনে সমাস হয়, তাদের বলা হয় সমস্যমান পদ। এখানে 'গাছে' ও 'পাকা', 'নীল' ও 'উৎপল' পদগুলি সমস্যমান পদ।
সমস্যমান পদগুলি মিলিত হয়ে যে পদ গঠিত হয় তাকে বলা হয় সমস্ত পদ

বা সমাসবদ্ধ পদ। 'গাছপাকা', 'নীলোৎপল' পদগুলি সমস্ত পদ।

সমাসবদ্ধ পদটিকে বিশ্লেষণ করবার জন্য যে বাক্যের প্রয়োজন হয়, তাকে বলা হয় ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহ বাক্য। গাছে পাকা কিংবা নীল যে উৎপল এই বাক্যগুলি ব্যাস-বাক্য বা বিগ্রহ বাক্য।

সমস্যমান পদগুলির প্রথম পদটিকে 'পূর্বপদ' এবং পরবর্তী পদটিকে বা পদগুলিকে 'উত্তরপদ' বা 'পরপদ' বলা হয়। এখানে 'গাছে' এবং 'নীল' পূর্বপদ। 'পাকা' এবং 'যে উৎপল' পরপদ।

সমাসের প্রকার ভেদ : সমাস প্রধানত ছয় প্রকার— দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, অব্যয়ীভাব, কর্মধারয়, দ্বিগু ও বহুব্রীহি। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, সমাস মূলত তিন প্রকার। (১) সংযোগমূলক— দ্বন্দ্ব (২) বর্ণনামূলক— বহুব্রীহি এবং (৩) ব্যাখ্যানমূলক— তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব।

১। দ্বন্দ্ব সমাস : যে সমাসে দুই বা তার অধিক পদের মিলন হয় এবং সমস্যামান প্রতিটি পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। সাধারণভাবে সমস্যমান পদগুলিকে সংযোজক অব্যয় যুক্ত করে। যেমন হর ও গৌরী = হরগৌরী, জায়া ও পতি = দম্পতি, মশা ও মাছি = মশামাছি।

দ্বন্দ্ব সমাসকে বেশ কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করা হয়। তার মধ্যে বিশেষ দুটি শ্রেণির নাম হল— একশেষ দ্বন্দ্ব এবং অলুক্ দ্বন্দ্ব।

ক) একশেষ দ্বন্দ্ব : যে দ্বন্দ্ব সমাসে দুটি বা তার বেশি পদ মিলে যখন একটি পদে পরিণত হয় তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব বলে। যেমন— তুমি, আমি ও সে = আমরা, রাম ও শ্যাম দুই ভাই = রামেরা।

খ) অলুক্ দ্বন্দ্ব : অ (অর্থাৎ না) লুক (অর্থাৎ লোপ) কথাটির অর্থ বিভক্তির চিহ্নলোপ না হওয়া।

যে দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদের বিভক্তির চিহ্ন লোপ হয় না, তাকে অলুক দ্বন্দ্ব-সমাস বলে।

যেমন মাঠে ও ময়দানে = মাঠেময়দানে।

কাগজে ও কলমে = কাগজেকলমে।

২। তৎপুরুষ সমাস : যে সমাসে পূর্বপদের কারক বা সম্বন্ধবোধক বিভক্তি

লুপ্ত হয়ে পরপদের অর্থই প্রধান হয়ে ওঠে, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। পূর্বপদের বিভক্তি অনুসারে তৎপুরুষ সমাসের নামকরণ ও শ্রেণিবিভাগ করা হয়। যেমন— দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ ইত্যাদি।

এ ছাড়া নঞ্ তৎপুরুষ, অলুক্ তৎপুরুষ প্রভৃতি সমাসও তৎপুরুষ সমাসেরই অন্তর্ভুক্ত।

যেমন :

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ—	শরণকে আগত = শরণাগত।
	দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী = দীর্ঘস্থায়ী।
তৃতীয়া তৎপুরুষ—	বিজ্ঞান দ্বারা সম্মত = বিজ্ঞানসম্মত।
চতুর্থী তৎপুরুষ—	বালিকাদের নিমিত্ত বিদ্যালয় = বালিকা বিদ্যালয়।
পঞ্চমী তৎপুরুষ—	কারা হইতে মুক্ত = কারামুক্ত।
	সর্প হইতে ভয় = সর্পভয়।
ষষ্ঠী তৎপুরুষ—	ছাত্রের সমাজ = ছাত্রসমাজ।
	পথের রাজা = রাজপথ।
সপ্তমী তৎপুরুষ—	জলে মগ্ন = জলমগ্ন।
	শিল্পে পটু = শিল্পপটু।

ক) নঞ্ তৎপুরুষ : যে তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদ নঞর্থক বা নিষেধার্থক অব্যয়, তাকে নঞ-তৎপুরুষ সমাস বলে। সংস্কৃত 'নঞ্' অব্যয়ের বাংলা প্রতিরূপ অ, অন্, অনা, আ, গর্, ন, না, বি ও বে। এখানে যেমন হয়েছে, অ— নেই মিল = অমিল, বি— নয় দেশ = বিদেশ, বে— নয় গতিক = বেগতিক ইত্যাদি।

খ) অলুক্ তৎপুরুষ : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির চিহ্ন লোপ হয় না, তাকে অলুক্ তৎপুরুষ সমাস বলে।

যেমন :

চোখে দেখা = চোখে দেখা।

পেটের (জন্য) ভাত = পেটেরভাত।

মনের মানুষ = মনের মানুষ।
কলেজে পড়া = কলেজে পড়া ইত্যাদি।

৩। অব্যয়ীভাব সমাস : যে সমাসে একটি পদ অব্যয় এবং সমাসবদ্ধ হওয়ার পর অব্যয়টির অর্থই প্রধান হয়ে দাঁড়ায় তাকে অব্যয়ভীব সমাস বলে। সামীপ্য, ব্যাপ্তি, সাদৃশ্য, পশ্চাৎ, অনতিক্রম, যোগ্যতা, সীমা প্রভৃতি অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়।

উদাহরণ—
কূলের সমীপ = উপকূল।
ক্ষণে ক্ষণে = অনুক্ষণ/প্রতিক্ষণ।
ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ।
প্রেরণার যোগ্য = অনুপ্রেরণা।
শৈশব থেকে = আশৈশব।
বছর বছর = ফি-বছর।

৪। কর্মধারয় সমাস : যে সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ যথাক্রমে বিশেষণে ও বিশেষ্যে বা বিশেষ্যে ও বিশেষণে বা বিশেষণে ও বিশেষণে গঠিত হয় তবে তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। কর্মধারয় সমাস মূলত তৎপুরুষ সমাসেরই প্রকারভেদ মাত্র।

যেমন :
মহৎ যে জন = মহাজন (বিশেষণ ও বিশেষ্য)
নব যে অন্ন = নবান্ন
যে খোকা সেই বাবু = খোকাবাবু (বিশেষ্য ও বিশেষণ)
যিনি পিতা তিনিই ঠাকুর = পিতাঠাকুর।
যে চালাক সেই চতুর = চালাক-চতুর (বিশেষণ ও বিশেষণ)
ভীষণও যে মধুর সে = ভীষণমধুর।

গঠন প্রকৃতির পার্থক্য অনুযায়ী কর্মধারয় সমাসকে আবার কয়েকটি পৃথক সমাসে বিভক্ত করা হয়েছে। সেগুলি হল মধ্যপদলোপী, উপমান, উপমিত ও রূপক।

ক) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় : যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাস-বাক্যের মধ্যস্থিত

ব্যাখ্যানমূলক পদের লোপ হয়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলা হয়। যেমন :

সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন।

পল (মাংস) মিশ্রিত অন্ন = পলান্ন।

এখানে ব্যাস-বাক্যের অন্তর্ভুক্ত 'চিহ্নিত' ও 'মিশ্রিত' পদগুলি লোপ পেয়েছে।

খ) উপমান কর্মধারয় : উপমান (যার সঙ্গে তুলনা করা হয়) পদের সঙ্গে সাধারণ ধর্মবাচক শব্দের যে সমা হয়, তাকে বলা হয় উপমান কর্মধারয়। যেমন : নিমের মতো তিতা = নিমতিতা, বকের ন্যায় ধার্মিক = বকধার্মিক, কুসুমের মতো কোমল = কুসুমকোমল।

গ) উপমিত কর্মধারয় : উপমান (যার সঙ্গে তুলনা করা হয়) পদের সঙ্গে উপমেয় (যার তুলনা করা হয়) পদের যে সমাস হয়। তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলা হয়। যেমন— কমলের মতো চরণ = চরণকমল, চাঁদের মতো মুখ = চাঁদমুখ।

ঘ) রূপক কর্মধারয় : যে কর্মধারয় সমাসে উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য এত নিবিড় হয় যে, উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়, তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন— মন রূপ মাঝি = মনমাঝি। এখানে 'মন' উপমেয় ও 'মাঝি' উপমান। 'মন' ও 'মাঝি'র মধ্যে সাদৃশ্য এত নিবিড় হয়েছে যে, দুটি বস্তুকে ভিন্ন কল্পনা করা যায় না। ঠিক এইভাবে ভবনদী, বিষাদসিন্ধু, কথামৃত, জীবনতরু, ভারতজননী ইত্যাদি হয়েছে।

৫. দ্বিগু সমাস : দ্বিগুও একপ্রকার তৎপুরুষ সমাস। যে তৎপুরুষ সমাসের সংখ্যাবাচক পদ বসে এবং পরপদের অর্থই প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। যেমন—

পঞ্চবটের সমাহার = পঞ্চবটী।

চারটি রাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা।

তিনটি কড়ির বিনিময়ে ক্রীত = তিনকড়ি।

৬. বহুব্রীহি সমাস : যে সমাসে পূর্বপদ বা পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান না হয়ে, তৃতীয় একটি অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন নীল কণ্ঠ যার = নীলকণ্ঠ, পূর্বপদটি 'নীল' অর্থাৎ 'বিষ', পরপদটি

'কণ্ঠ'। সমাসবদ্ধ হয়ে হয়েছে 'নীলকণ্ঠ'। সমাসবদ্ধ পদটিতে 'নীল' বা 'বিষ' কিংবা 'কণ্ঠ' না বুঝিয়ে, যার কণ্ঠে বিষ থাকে অর্থাৎ মহাদেব শিবকে বোঝানো হয়েছে। অতএব দেখা গেল যে, পূর্বপদ বা পরপদের অর্থ প্রধান না হয়ে, তৃতীয় একটি পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইভাবেই পীতাম্বর, বীণাপাণি, ব্রজপাণি ইত্যাদি বহুব্রীহি সমাস হয়েছে।

বহুব্রীহি সমাসও কয়েক প্রকারের হয়। যেমন— সমানাধিকরণ, ব্যাধিকরণ, ব্যাতিহার, মধ্যপদলোপী, অলুক্, নঞর্থক ইত্যাদি।

ক) সমানাধিকরণ বহুব্রীহি : যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হয় এবং দুটি পদই সমান অর্থাৎ প্রথমা বিভক্তি যুক্ত হয়, আর একই বস্তু বা ব্যক্তিকে নির্দেশ করে, তাকে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি বলা হয়। যেমন পীত অম্বর যার = পীতাম্বর। পক্ক কেশ যার = পক্ককেশ।

আবার অনেক সময় সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদটি বিশেষ্য হয়েও বিশেষণ-স্থানীয় রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন ভূতেদের নাথ যিনি = ভূতনাথ, মেঘ বাহন যার = মেঘবাহন ইত্যাদি।

খ) ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি : যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ ও উত্তরপদ দুটিই বিশেষ্য এবং যার উত্তরপদ সবসময়ই সপ্তমী বিভক্তি হয়, তাকে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি বলে। যেমন— শূল পাণিতে যার = শূলপাণি, ঘরে মুখ যার = ঘরমুখো।

গ) ব্যাতিহার বহুব্রীহি : পরস্পর-সাপেক্ষ ক্রিয়া বা পরস্পর ক্রিয়া-বিনিময় বোঝাতে যে বহুব্রীহি সমাসে একই পদ দ্বিত্ব হয়ে পূর্বপদ ও পরপদ রূপে বসে, তাকে ব্যাতিহার বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন : লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ = লাঠালাঠি ; কানে কানে যে কথা = কানাকানি।

ঘ) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি : যে বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যের ব্যাখ্যানমূলক মধ্যবর্তী পদগুলি লোপ হয়, তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস বলা হয়। যেমন— দরিয়ার মতো প্রশস্ত দিল (হৃদয়) যার = দিলদরিয়া ; মৃগের নয়নের মতো নয়ন যে নারীর = মৃগনয়না। এরকম সোনামুখি, কমলাক্ষ প্রভৃতি।

ঙ) অলুক্ বহুব্রীহি : যে বহুব্রীহি সমাসে বিভক্তির চিহ্ন লোপ হয় না তাকে অলুক বহুব্রীহি সমাস বলা হয়। যেমন : গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে

= গায়ে হলুদ। এরূপ— হরির উদ্দেশে লুট দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হরির লুট ইত্যাদি।

চঃ নঞ্ বহুব্রীহি : যে বহুব্রীহি সমাসে নঞ্র্থক নির্ বা নি যুক্ত পূর্বপদ থাকে তাকে নঞ্ বহুব্রীহি সমাস বলা হয়। যেমন নাই টোল যার = নিটোল ; নাই রস যার = নীরস ; নেই ভুল যাতে = নির্ভুল ইত্যাদি।

৫। রচনা লিখন—